

কর্মজীবী নারীদের মানসিক স্বাস্থ্য

সিরাজুম মনিরা

বেশিরভাগই দেখা যায়, একটি জাতির মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হলো নারী। আর এই নারী ঘরে ও বাহিরে সামলে চলেন সমান দক্ষতায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা পুরুষের চেয়েও বেশি দক্ষ প্রমাণিত হন। রান্নাঘরে হাতা-খুস্তি হাতে বলুন কিংবা কম্পিউটারে কি-বোর্ডে বলুন, নারী নিজেকে প্রমাণ করে চলেছেন প্রতিনিয়ত। ব্যবসা, প্রকৌশল, শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্প সবক্ষেত্রেই নারী এগিয়ে যাচ্ছেন। একই সঙ্গে সংসার ও অফিস সামলে চলা কখনই সহজ বিষয় নয়। বরং অনেক সময় এই কারণে কর্মজীবী নারী ক্লান্ত হয়ে যেতে পারেন।

সুমনা কাজ করছেন দীর্ঘদিন ধরে একটি বহুজাত কোম্পানিতে, যিনি তার কাজের দক্ষতার জন্য সবার কাছেই পরিচিত। কিন্তু সম্প্রতি তিনি মা হওয়ায় কাজে ঠিকভাবে মন দিতে পারছেন না। তার অফিসে প্রায়ই দেরি হচ্ছে, মাঝে মাঝে তিনি অফিসে ঘুমিয়ে যাচ্ছেন এবং মেজাজও আগের থেকে খিটিমিটে হয়ে গেছে। অনেকে ব্যাপারটা নিয়ে তাকে তার কাজের দক্ষতার বিষয়ে কথা বলছেন। এতে সুমনা আরও বেশি করে নিজের মেজাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন। এর ফলে তিনি দিনদিন মনমরা হয়ে যাচ্ছেন, ঠিকমতো ঘুম হচ্ছে না তার, কোনো কাজে আগের মতো আর আগ্রহ পাচ্ছেন না। নারী হোক সে কর্মজীবী অথবা গৃহিণী দুই জায়গায়ই মানসিক স্বাস্থ্য এখনো অবহেলিত, অপ্রকাশিত এবং অনিশ্চিত। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের এক জরিপে দেখা গেছে দেশের ১৮.৭ ভাগ লোক কোনো না কোনো মানসিক রোগে ভুগছেন এবং মহিলাদের আক্রান্তের হার যেখানে ২১ শতাংশ, সেখানে পুরুষদের ১৫ ভাগ মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। এখনো বিশ্বের অনেক দেশে পুরুষদের থেকে নারীরা মানসিক রোগে বেশি ভুগে থাকেন।

নারী, পুরুষ সবার মাঝে সব ধরনের মানসিক সমস্যা দেখা দিলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীদের মাঝে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। যেমন বিষণ্ণতা-নারীদের মাঝে বিষণ্ণতার অন্যতম কারণ হিসেবে পারিবারিক কলহ, যৌতুক প্রথা, শৈশবকালীন মানসিক আঘাত, সামাজিক এবং পারিবারিক বৈষম্যতাকে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। উদ্বিগ্নতা-দৈনন্দিন জীবনের পারিবারিক এবং কমন পরিবেশের সঙ্গে সঠিকভাবে মানিয়ে নিতে না পারা বা অনেক সময় নারীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া দায়িত্ব থেকেও নারীরা উদ্বিগ্নতায় ভোগেন। কনভারশন ডিসঅর্ডার-মানসিক চাপের শারীরিক প্রকাশকে কনভারশন ডিসঅর্ডার বলে। যথাযথ সামাজিক দক্ষতা এবং আত্মনির্ভরশীলতার অভাবে অনেক নারীই মানসিক চাপকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ফলে অবচেতন মনেই এ রোগটি শারীরিক উপসর্গ হিসেবে ধরা পড়ে। পোস্ট পারটাম মেন্টাল ডিসঅর্ডার-বাচ্চা জন্ম দেওয়ার পর অনেক মায়ের মাঝে এ সমস্যাটি দেখা দেয়, এর জন্য হরমোনাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘদিন না ঘুমিয়ে থাকা, শারীরিক পরিবর্তন, এবং অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের সহযোগিতার অভাবে নারীদের মাঝে বিষণ্ণতা এমনকি গুরুতর মানসিক সমস্যাও হতে পারে। সোম্যাটো ফর্ম ডিসঅর্ডার-যাদের মাঝে দীর্ঘদিন ধরে কোনো মানসিক চাপ অমীমাংসিত অবস্থায় থেকে যায়, শারীরিক উপসর্গ যেমন-মাথাব্যথা, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা কারও কারও শারীরিক প্রকাশ যতটুকু হওয়ার কথা তার থেকেও তীব্রভাবে দেখা যায়। পোস্টট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার-এ ক্ষেত্রে মানসিক চাপ দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য মানসিক চাপ থেকে আলাদা। যেমন-বড়ো ধরনের জলোচ্ছ্বাস, অগ্নিকাণ্ড, সিডর, ভূমিকম্প বা একজন নারী যদি অ্যাসিড বার্ন বা যৌন হয়রানির শিকার হন তাহলে সে ক্ষেত্রে পোস্টট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার দেখা যায়।

সময়ের সঙ্গে ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে আমাদের জীবন। বাড়ছে পেশাগত চাপ। ফলে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগের কারণও দিন দিন বাড়ছে। এ কারণে কর্মজীবী পুরুষের চেয়ে কর্মজীবী নারীরা একটু বেশিই ঝুঁকিতে থাকছেন। ভারতের পুনের একদল চিকিৎসকের গবেষণায়ও তার প্রমাণ মিলেছে। এর কিছু কারণও চিহ্নিত করেছেন তাঁরা। যেগুলো নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ভীষণ জরুরি। চলুন সেসব কারণ জেনে নিই, যাতে নিজ নিজ জায়গা থেকে এসব ব্যাপারে সচেতন হতে পারি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কেবল ঘরেই নয়, অফিসেও নারীকে উঁচু আসনে দেখতে চায় না। ফলে প্রায়ই দেখা যায়, নারী কর্মীদের যোগ্যতার মূল্যায়ন করা হয় কম। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা পুরুষ সহকর্মীদের সমান সুযোগ পান না। আবার অনেক অফিসে পরিবেশটাই থাকে তাঁদের প্রতিকূলে। সেই অপ্রাপ্তি বা বঞ্চনা থেকে তাঁদের মধ্যে তৈরি হয় হতাশা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ঘরের প্রায় সব কাজের দায়িত্বই থাকে নারীর কাঁধে। সম্প্রতি এই ধারায় খানিকটা পরিবর্তন এসেছে। তবে তা সামগ্রিক অর্থে নয়। সব ঘরে তো নয়-ই। ফলে সারা দিন অফিসে কাজ করার পর রাতে বাড়িতে এসে আবারও ঘরের কাজে কোমর বেঁধে নামতে হয় নারীদের। এ কারণে নিজের মনের যত্ন নেওয়ার ফুরসত মেলে কম। নারীদের কেবল ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবলেই চলে না। তাঁদের ওপর থাকে সমাজের নানা প্রত্যাশা। তাঁকে দেখতে সুন্দর হতে হবে। সব সময় সেজেগুজে থাকতে হবে। সময়মতো বিয়ে করে সন্তান নিয়ে সংসার গোছাতে হবে। এমনকি শরীর মুটিয়ে গেলেও পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি কথা শুনতে হয়। চাকরির পাশাপাশি নারীদের এসব সামাজিক চাপও সামলাতে হয়। নারীদের নানা রকম পারিবারিক দায়িত্বও সামলাতে হয়। নিজের ও স্বামীর পরিবারের খুঁটিনাটি বিষয়ে রাখতে হয় নজর। সন্তানের দেখাশোনা তো বটেই, তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টাও মূলত তাঁদের ঘাড়ের উপরেই থাকে। সে কারণে ছুটি নিতে গিয়েও অনেক সময় পোহাতে হয় ব্যক্তি। অবসর সময় সম্পর্কে চিন্তা করা কর্মজীবী মহিলাদের জন্য একটি স্বপ্ন কারণ ছুটির দিনগুলিও মূলতুবি কাজগুলি শেষ করার জন্য উন্মত্ত হয় যখন তারা বাচ্চারা স্কুলে কীভাবে পারফর্ম করছে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। অফিসের কাজ থেকে যে কোনো অবসর সময় গৃহস্থালি কাজে ব্যবহার করা হয় এবং কর্মজীবী মহিলাদের জন্য সামান্য অবসর সময় থাকে। এ সবই প্রভাব ফেলে তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর।

কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ সময়ের পরিক্রমাতে বেড়েই চলেছে। তবে সামগ্রিকভাবে কর্মজীবী নারীদের কর্মস্থলের বর্তমান অবস্থা তেমন অনুকূলে নয় বললেই চলে। এখানে লিঙ্গবৈষম্য, পক্ষপাত, যৌন নির্যাতন, শত্রুতা, নিরাপত্তার অভাব, অবকাঠামোগত সমস্যা, যাতায়াতের অব্যবস্থাপনা ইত্যাদি প্রায়শই দেখা যায়। সকালে যানবাহনে ওঠা থেকে শুরু করে সন্ধ্যায় বাসায় পৌঁছানো অবধি এই প্রতিকূল অবস্থা বিরাজমান। অনেক অফিসে কাজ করার জন্য অনুকূল পরিবেশ থাকে না। যেমন ধরা যাক, টয়লেটের অব্যবস্থাপনা। মেয়েরা স্বভাবগতভাবেই এই ব্যাপারটি নিয়ে খুবই দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকেন। মাসের বিশেষ দিনগুলোতে এই কষ্টটি আরো বেড়ে যায়। এরকম বিভিন্ন প্রতিকূলতার ফলে নারী মানসিক চাপ, হতাশা, অতিরিক্ত ও অহেতুক চিন্তা, মায়বিক দুর্বলতা, বিষণ্ণতায় ভুগতে পারেন। এতে তার কাজের মান নষ্ট হয়, পদোন্নতি আটকে যায়, ফলে অনেকে চাকরি নামক এই সোনার হরিণের হিঁটা টানেন। আবার, আমাদের সমাজে অনেক ক্ষেত্রে নারীকে একজন মানুষ হিসেবে নয় বরং নারী হিসেবে বেশি দেখা হয়।

কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে মানুষের ধারণা এখনো সীমিত। ইদানীংকালে পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরা নিজেদের ক্যারিয়ার নিয়ে বেশ সচেতন হয়েছে। নারীর পেশা গ্রহণের ফলে সকলের মধ্যে মানসিক চাপ সৃষ্টি হওয়ায় ধীরে ধীরে নারী-পুরুষ সকলে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে অধিক সচেতন হতে শুরু করেছে। পেশাজীবন শুরুর পূর্বে মনোবিজ্ঞানীর অধীনে ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং করে নিলে, নিজের সম্পর্কে ব্যক্তির ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। ফলে পেশা নির্বাচনে প্রথম জীবনেই সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া খুব সহজ হয়ে যায়। কাজের প্রতি ইচ্ছা আগ্রহ, কর্মসম্পৃষ্টি, কর্মদক্ষতা, কর্ম অভিজ্ঞতা, কর্মক্ষেত্রে সঠিক পরিবেশ সকল কিছুর ওপর নির্ভর করে ব্যক্তির মানসিক সুস্থাস্থ্য। পেশাজীবন ও কর্মক্ষেত্রে সমস্যা, ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। ঠিক তেমনি ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক জীবনের সমস্যাও পেশাজীবন ও কর্মক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। পরিবারে মা বাবা দু'জনই বাইরে কাজ করলে সন্তানের জন্য অনেক ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। একক পরিবার মেয়েরা চাকরি করে সন্তানের দেখাশোনার সার্বিক দায়িত্ব নিতে হিমশিম খাচ্ছে। বর্তমানে যৌথ পরিবার না থাকার কারণে মা অথবা শাশুড়ির সহায়তা পাওয়ার সুযোগ থেকে মেয়েরা বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে শিশুরা বাড়িতে কাজের লোকের হাতে বড়ো হচ্ছে, বিশেষত কাজের লোক পাওয়াও জটিল। এসব নিয়ে পরিবারে বিভিন্ন ধরনের টেনশন সৃষ্টি হচ্ছে। কর্মজীবী মা-বাবা সকালে বেড়িয়ে গিয়ে বিকালে, সন্ধ্যায় বা রাতে বাড়ি ফিরছেন। সন্তানের সার্বিক দেখাশোনা, স্কুলে নিয়ে যাওয়া, বাড়িতে হোমওয়ার্ক করানো, টিচার, কোচিং ইত্যাদি কাজ মা-বাবার মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতে পরিবারে অনেক ধরনের টেনশন সৃষ্টি হয়। এছাড়া বাড়ি ফিরে আবার ঘরের স্বাভাবিক কাজকর্ম নিয়েও ব্যস্ততার বিষয় রয়েছে। একক পরিবারে কর্মজীবী মা-বাবারা অনেক ধরনের বাড়তি ঝামেলার শিকার হয়ে থাকেন। কর্মক্ষেত্রে সঠিক পরিবেশ, সহকর্মীদের সহযোগিতা ও সহমর্মিতা, বেতন কাঠামো, প্রমোশন, বসের আচরণ, মহিলাদের প্রতি সম্মান ইত্যাদি মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। কর্মক্ষেত্রে এ সবকিছু যথাযথ থাকার পরও ইদানীংকালে অনেকের মধ্যে বারবার চাকরি বা ব্যবসা পরিবর্তন করার প্রবণতা বা সিদ্ধান্তহীনতা দেখা যায়। সব শেষে চাকরি অথবা ব্যবসা পেশাজীবন ছেড়ে দেওয়ার ঝোঁক বা প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে। এসব সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য দক্ষ মনোবিজ্ঞানীর সহায়তা নিলে খুব সহজে পেশাগত সমস্যা সমাধান ও ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক জীবনের উন্নতি করা যেতে পারে।

তাল মিলিয়ে চলতে পারাই তো জীবন। আর তাই কর্মজীবী মায়েদের জন্য কিছু পরামর্শ: মেনে নিন আপনাকে একজন সাধারণ গৃহিণীর চেয়ে বেশি কাজের চাপ নিতে হবে। এই ধরনের মানসিকতা আপনাকে মানসিক শক্তি যোগাবে। কাজের চাপ কমাতে আগে থেকেই কর্মপরিকল্পনা তৈরি করুন। প্রয়োজনে কাজগুলোকে ছোটো ছোটো ভাগে ভাগ করে নিন। কর্মজীবী নারীদের তাঁদের পরিবার, অফিসের কাজ, বন্ধুত্ব সব কিছুকে একসাথে পরিচালনা করতে গিয়ে কোন কাজ কখন করবেন, কীভাবে করবেন, আমি করতে পারব কি না' এসব ভাবতে ভাবতেই বিভিন্ন মানসিক চাপ, উদ্বেগ, হতাশা ইত্যাদি তৈরি হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে এই সময় ব্যবস্থাপনা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আমাদের কাজগুলো ৪ ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমনঃ জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ। জরুরি কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কম জরুরি কাজ। সবশেষে গুরুত্বপূর্ণও নয় এবং জরুরিও নয় এমন কাজ। এবার এসব কাজকে জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ এর ওপর ভিত্তি করে সাজাই। গুরুত্বপূর্ণ তেমনি জরুরি, তাই এই কাজটি আমি আগে করব। এরপর এর সাথে বাকি কাজগুলো করব। এভাবে প্রায়োরিটি তৈরি করে কাজ করলে আমাদের উদ্বেগ, মানসিক চাপ ইত্যাদি কম হবে।

সপ্তাহান্তে ছুটির দিনটি কাজে লাগান। মনের পরিচর্যা করুন। পরিবার নিয়ে ঘুরতে যান নতুন কোনো জায়গায়। সিনেমা দেখুন। মঞ্চ নাটক, গানের অনুষ্ঠানে যান। প্রিয় কারো আড্ডার জায়গায় যেতে পারেন। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করুন। নতুন করে কাজের শক্তি পাবেন। বড়ো ছুটি পেলে ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়ুন। আজকাল প্যাকেজ ট্যুরের সুবিধা আছে। কাজটাকেই জীবনের সব কিছু বলে ধরে নেবেন না। শখের চর্চা করুন। কেউ কেউ হয়ত ছাত্রজীবনে গান করতেন। চর্চাটা আবার শুরু করতে পারেন। গীটার বাজানো, পেইন্টিং, ফটোগ্রাফি, বাগান করা, লেখালেখির চর্চা- যার যেখানে শখ এবং দক্ষতা রয়েছে সেটি করতে পারেন। এই শখের চর্চাটাই আপনাকে বিষণ্ণতা ও ক্লান্তি থেকে দূরে রাখতে পারে। নিয়মিত ডান্ডার দেখান কর্মজীবী নারীরা ছোটোখাটো শারীরিক সমস্যাকে উপেক্ষা করেন। ব্যস্ততার দোহাই দিয়ে ডান্ডার বাড়িতে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন। এই ছোটোখাটো স্বাস্থ্য সমস্যাই পরে বড়ো আকার নিতে পারে। তাই অবহেলা নয়। নিয়মিত ডান্ডার দেখান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করুন। বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ক্যানসারের স্ক্রিনিং টেস্ট করুন। খুব বেশি ক্লান্তি, হতাশা, কাজের প্রতি অসম্পৃষ্টি মনে হলে মনোবিদের পরামর্শ নিন। সহকর্মীদের সঙ্গে পরচর্চা, পরিনিদায় অংশ নেবেন না। সম্ভব হলে নিরুৎসাহিত করবেন। খুব বেশি হতাশার চর্চা করবেন না। নিজের ব্যক্তিগত সমস্যার কথা একান্ত বন্ধুর সঙ্গে শেয়ার করুন নয়তো মনোবিদের সঙ্গে। নেতিবাচকতার চর্চা করবেন না। সুষম খাবারে জোর দিন, অতিরিক্ত ক্যালরি পরিহার করুন। আবার কম

খাবেন এমনও নয়। খাবারে বৈচিত্র্য আনুন। ফল ও সবজি যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। সঠিক খাদ্যাভ্যাস আপনাকে অনেকটাই ভালো রাখবে। সব সময় বর্তমানে থাকা অর্থাৎ অতীত বা ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি চিন্তা না করা। শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকতে হবে অর্থাৎ কোনো কিছু করতে হবে বা করার কথা ভেবে সেটাকে ফেলে না রেখে তা করার চেষ্টা করা। পরে করব ভেবে কাজ ফেলে রাখলে একসময় অনেক কাজ জমা হয়ে যায়। যার কারণেও পরে মানসিক চাপ হতে পারে। সঠিক সময়ে কাজ করলে আমাদের লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে, শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকলে আমাদের মস্তিষ্কে রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়, যা আমাদের মেজাজকে ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন হতে সাহায্য করে। ঘুম থেকে উঠুন সকালে, নিয়মিত হালকা ব্যায়াম করুন।

কোনো নারীকে প্রশংসা করা হলে তিনি বিনয়ের কারণে অনেক সময় বলে থাকেন, প্রশংসা করার মতো কিছু করিনি। কিন্তু কেউ যদি আপনার কাজের প্রশংসা বা কোনো গুণের প্রশংসা করে, তাহলে তা গ্রহণ করুন। সেই ভালো লাগাটুকু উপভোগ করুন। দেখবেন, তাতে কাজ করার জন্য আরও সাহস ও শক্তি পাবেন। কেউ ভালো কাজ করলে তার প্রশংসা করুন: অন্যের প্রতি সহজ হতে পারি, কারো সাহায্য লাগলে এগিয়ে যেতে পারি। এগুলো আমাদের ইতিবাচক শক্তি দেয়, যা আমাদের মনের যন্ত্রের জন্য ইতিবাচক হিসেবে কাজ করে। শরীরকে সুস্থ ও মনকে শান্ত রাখার জন্য আমরা কিছু কাজ করতে পারি। যেমন: ইয়োগা করা। মাইন্ডফুলনেস থাকার জন্য চর্চা করা। মেডিটেশন করা। শারীরিক ব্যায়াম করা। নিজের পছন্দের কাজ করা ইত্যাদি। সবাইকে খুশি রাখার আগে নিজেকে ভালোবাসতে হবে। আপনি যদি নিজেকে ভালোবাসেন বা যত্ন না করেন তবে আপনি আপনার শতভাগ কাউকে দিতে পারবেন না। নিজেকে ভালোবাসা মানে নিজের যত্ন নেওয়া।

উন্নত বিশ্বে প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে গড়ে প্রায় ১০ শতাংশ কর্মী কেবল বিষণ্ণতার কারণে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। বিষণ্ণতার কারণে বছরে গড়ে ৩৬ কর্মদিবস নষ্ট হয়। কিন্তু বিষণ্ণতায় আক্রান্ত ৫০ শতাংশ কর্মী চিকিৎসাসেবা নেন না। অনেক সময় মানসিক সমস্যার কথা মুখ ফুটে বললে চাকরি হারানোর ভয় থাকে। দেশে অনেক ক্ষেত্রে নারীদের মধ্যে কর্মস্থলে মানসিক স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বেশি দেখা গেছে। তবে কাজের চাপ, অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা, উদ্বেগ, পরিবারে সময় কম দেওয়া ইত্যাদি কারণে নারী-পুরুষ উভয়ের ওপর মানসিক চাপ বাড়ে, যা কর্মদক্ষতা কমিয়ে দেয়। কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যবান্ধব করতে এবং নারীকর্মীদের মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে চাকরিদাতা ও কর্মীদের সচেতন হতে হবে। গুণগত মানসম্মত কর্মী নিয়োগ, শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া, কর্মীদের মনের যন্ত্রের জন্য কাজের পাশাপাশি বিনোদনমূলক কার্যক্রম চালু রাখলে (পিকনিক, চা চক্র ইত্যাদি) কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ কমাবে। যেসব নারীকর্মীর শিশুসন্তান রয়েছে, তাদের জন্য কর্মক্ষেত্রে ‘শিশু যত্ন কেন্দ্র’ থাকা উচিত। যে কারও সাফল্যকে উদ্যাপন করতে হবে, ব্যর্থতাকে বারবার তুলে ধরা যাবে না, ব্যঞ্জবিদ্রুপ করা চলবে না। কারও মধ্যে বিষণ্ণতা, উদ্বেগ বা আচরণজনিত সমস্যা দেখা দিলে সেটি নিয়ে তার সঙ্গে আলাদা কথা বলতে হবে। সব মানসিক চাপ আপনি একা সামলাতে পারবেন এ ধারণা থেকে বের হয়ে আসুন, প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

#

লেখক: সিভিল সার্জন, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা

পিআইডি ফিচার